বিশেষ প্রতিবেদন

ছাত্রলীগের তখন এখন

জনগণের রায়ে নির্বাচিত হয়ে পাঁচ বছরের জন্য ক্ষমতায় এখন বিএনপি। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রদের রায়ে নয়, ছাত্রদল দখলের মাধ্যমে তাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিতাড়িত হয়েছে ছাত্রলীগ। একপেশে এই ছাত্র রাজনীতিতে ছাত্রলীগের অবস্থান কোথায়... লিখেছেন **জয়ন্ত আচার্য**

সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থ হয়েছিল আওয়ামী লীগ সরকার। তারই মূল্য দিতে হয়েছে অষ্টম সংসদ নির্বাচনে হেরে। দলীয় নেতা-কর্মী এবং তাদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্য দিয়ে সন্ত্রাস পৌঁছেছিল সর্বক্ষেত্রে। বাদ পড়েনি ছাত্ররাজনীতিও। ১৯৯৮ সালের ২৩ এপ্রিলের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টি হলই দখল করে নেয় ছাত্রলীগ।

দৃশ্যপট পাল্টে যায় ২ অক্টোবর ভোর রাতে। মুখে সন্ত্রাস নির্মূলের কথা বলে খালেদা জিয়া তখন সরকার গঠনের পরিকল্পনা করছিলেন। নির্বাচনের ফলাফল সে কথাই বলছিল। ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের ক্যাডাররা তখন ব্যাগ গোছাতে শুরু করেছিল। একদল রওনা দেয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে, অন্যদল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ছাড়তে। কোমরে অস্ত্র নিয়ে হল গেটে হাজির হয় ছাত্রদল নেতা, ক্যাডার। 'আমরা এসেছি, তোমরা চলে যাও' এই বলে খবর পাঠায় তারা। এতেই কাজ হয়ে যায়। রাত পোহানোর আগেই পুরো হল দখলে চলে যায় ছাত্রদলের। এই চিত্র ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুহসীন হলের। একে একে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলো হল দখলে নিয়ে নেয় ছাত্রদল। সারা দেশেই চলে তাদের এই অভিযান। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল, ঢাকা কলেজ এমনকি সারা দেশের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই বাদ যায়নি এই অভিযান থেকে। সাপ্তাহিক ২০০০-এর বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিদের দেয়া সংবাদে এ চিত্রই ফুটে উঠেছে।

দখলের ধারাবাহিকতা

একানব্বইয়ের বিএনপি সরকারের আমলে ছাত্রলীগ বেশ সক্রিয় ছিল। তবে বিবদমান তিনটি গ্রুপের অন্তর্দ্বন্দ্বে তখনও ছাত্রলীগ নাজুক অবস্থায় পড়ে যায়। ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নেতা বাদল হত্যার পর অভ্যন্তরীণ কোন্দল আরো তীব্র হয়ে ওঠে। জহুরুল হল দখল করে নেয় ছাত্রলীগের থার্ড ওয়ার্ল্ড নামে পরিচিত মন্টু গ্রুপ। তখন গ্রুপটি জাতীয়তাবাদী ছাত্রলীগ নামে পরিচিতি লাভ করে। ছাত্রলীগের কার্যক্রম একমাত্র জগন্নাথ হলে সীমিত হয়ে পড়ে। এমন অবস্থায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলনে ছাত্রলীগ বেশ জোরালো ভূমিকা রাখে। সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হলে ছাত্রলীগ উত্তরপাড়ার হলগুলো দখলে তৎপর হয়। উত্তরপাড়ার হলগুলোতে আধিপত্য বিস্তারের জন্য ছাত্রলীগকে ছয় মাস অপেক্ষা করতে হয়েছে। অবশেষে মাদারীপুরের পিচ্চি শামীমের নেতৃত্বে ছাত্রদলের একটি অংশের সহযোগিতায় ছাত্রলীগ এফ রহমান ও মুহসীন হল দখল করে নেয়। এ সময় ক্যাম্পাসে ছাত্রদল তাদের হারানো হলগুলো পুনরায় দখল পেতে ধর্মঘট ডাকে, আন্দোলনের কর্মসূচি দেয়। '৯৮ সালের ২৩ এপ্রিল ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা পার্থ প্রতিম আচার্য নিহত হয়। মামলার ভয়ে ছাত্রদলের ক্যাডার হল ছেড়ে দিলে ছাত্রলীগ উত্তরপাড়ার জসীম উদ্‌দীন, মুজিব, জিয়া, সূর্যসেন হল দখল করে। ক্যাম্পাসে একক আধিপত্য হয় ছাত্রলীগের। তবে এ ঘটনার পর আপোসরফা চলে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মাঝে। ছাত্রদলের সাধারণ কর্মীরা হলে উঠে আসে।

ছাত্রদলের লাল্টু ও পিন্টু গ্রুপের বিরোধের কারণে ক্যাম্পাসে আধিপত্য নেয় লাল্টু গ্রুপ। এ সময় ছাত্রদলের সভাপতি নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টুকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়। সব কয়টি হলে আধিপত্য বিস্তারের পর ছাত্রলীগ আবারও জড়িয়ে পড়ে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বে। বাগেরহাট, মাদারীপুর, শরীয়তপুর তিনটি গ্রুপ প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। চলে ক্যাডারদের সশস্ত্র মহড়া। এ সময়ে আওয়ামী

সশস্ত্র ছাত্রদল কর্মীদের জগন্নাথ হল পুনরায় দখল

লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি এনামুল হক শামীম ও সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্নার নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। দাবি ওঠে সম্মেলনের। আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের নতুন নেতৃত্বের জন্য খুঁজতে থাকেন নিয়মিত ছাত্র। '৯৮ সালের ২২ অক্টোবর ছাত্রলীগের সম্মেলনে বাহাদুর বেপারীকে সভাপতি ও অজয় কর খোকনকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়। ছাত্রলীগের ইতিহাসে সবচেয়ে সুবিধাজনক সময়ে নেতৃত্ব আসে তাদের কাছে। অনেকে অভিযোগ করেন, এমন সুসময়ে থেকেও ছাত্রলীগের শক্ত ভিত্তি তারা গড়ে তুলতে পারেনি। বর্তমান ১৬টি জেলায় ছাত্রলীগের সাত বছর ধরে কোনো কমিটি নেই। নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল, চট্টগ্রাম, রাজশাহীতে কমিটি নেই দশ বছর। শেরপুর, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, নড়াইল, জয়পুরহাট, শরীয়তপুরে ৭-৮ বছর ধরে কমিটি গঠন করা হয়নি। সংবিধান অনুসারে ছাত্রলীগের ১০১ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি। দ্বন্দ্ব মেটাতে চিঠি দেয়া হয় ১৩৯ জনকে। নতুন কমিটির অধিকাংশ নেতা সংগঠন গড়ে তোলার বদলে ব্যবসা নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। নতুন কমিটি ছাত্রলীগের ৮২টি জেলার মধ্যে তিন বছরে ১০টি জেলায় সম্মেলন করেছে। ২৫টি জেলায় নামমাত্র কমিটি গঠন করা হয়েছে। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কমিটি গঠনের জন্য আন্তরিকভাবে উদ্যোগ নেয়নি বলে অনেকেই অভিযোগ করেছেন। দলের সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে নানা তদবির ও পারসেনটেজের অভিযোগ রয়েছে। এ কারণে সংগঠনের কাজ হয়ে ওঠে গতিহীন। সংগঠন শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে মিটিং-মিছিলকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে।

ছাত্রলীগের ত্যাগী নেতারা নবাগতদের জন্য ধীরে ধীরে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। ক্রমেই সংগঠন হয়ে পড়ে দুর্বল। বিভিন্ন কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৫৮ জন ছাত্রলীগ কর্মী ও ক্যাডারকে বহিষ্কার করে। নেতা ও সাধারণ কর্মীদের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে। ভিত্তিহীন অবস্থায় এসে দাঁড়ায় ছাত্রলীগ। এ কারণে নির্বাচনের সময় ছাত্রলীগ সাংগঠনিকভাবে আওয়ামী লীগকে তেমন সহযোগিতাই করতে পারেনি। নির্বাচনের ভরাডুবির পর কোনো রকম দাঁড়িয়ে থাকা ছাত্রলীগের খোলসটা ভেঙে পড়ে মাত্র এক সপ্তাহের মাঝে। ছাত্রলীগের ইতিহাসে সবচেয়ে অথর্ব সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বাহাদুর বেপারী ও অজয় কর খোকন নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

দখল, নির্যাতন, বিতাড়িত...

১ অক্টোবর রাতে নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফল আঁচ করতে পেরে ছাত্রলীগের ক্যাডার ও কর্মীদের মনোবল ভেঙে যায়। তারা হল ছাড়তে শুরু করে। এ সময় কেন্দ্রীয় নেতারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান রক্ষার চেষ্টা না করে নিজেরাই আত্মগোপন করে। নবাগতরা অনেকেই যোগ দেয় ছাত্রদলে। ছাত্রদল নেতা টিটো, মোর্শেদ, আতিক, জসীম উদ্‌দীন হল, শিশির নাহিন মুহসীন হল; আসাদ, বাবু কুদ্দুস জিয়া হল; সোহাগ টগর, এসএম হল; উজ্জ্বল; সাইফুর রহমান, আজম এ এফ রহমান হল; জয়ন্ত, তরুণ জগন্নাথ হল দখল করে নেয়। দখলকারীরা ছাত্রদলের সভাপতি নাসিরউদ্দিন আহমেদ পিন্টু, সাধারণ সম্পাদক শাহাবুদ্দিন লাল্টু ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি মনির হোসেনের তিনটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ে। নির্বাচনের দুইদিন পর ৩ অক্টোবর ছাত্রদল ক্যাম্পাসে মিছিল বের করে। এ মিছিলের পরে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ থেকে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বাহাদুর বেপারী ও সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকনকে ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়। বের করে দেয়া হয় ছাত্রদলীগের হলগুলোতে অবস্থানরত সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে ৩ অক্টোবর দখল নেয় ছাত্রদল নেতা লিটন, পাভেলসহ কয়েকজন বহিরাগত। তারা হলে এসে ২০১, ২০৫, ২১৮, ২১৯, ৩০১, ৩১৮ নম্বর রুম, ভাঙচুর ও লুটপাট করে। প্রতিটি হলেই চলে দখল ও ভাঙচুর। মুজিব হল থেকে বঙ্গবন্ধুর ছবি নামিয়ে ফেলা হয়।

এখন সারা দেশে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের ওপর চলছে অমানবিক নির্যাতন। পালিয়ে বেড়াচ্ছে নেতা-কর্মীরা। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির হিসাব অনুসারে সারা দেশে ছাত্রলীগের ৭ হাজার ৫৫১ জন গ্রেপ্তার হয়েছে। নির্যাতনের শিকার হয়েছে সহস্রাধিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হলের আবাসিক ছাত্ররা রামপুরা, মিরপুর, মোহাম্মদপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় মেস করে থাকছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ছাত্রলীগের হল কমিটির নেতা থাকছেন মোহাম্মদপুরে এক মেসে। তিনি বলেন, আমরা ছয় ছাত্রলীগ কর্মী মেসটি করেছি। বাড়ি থেকে নিয়মিত টাকা আসে না। পুলিশের ভয়ে থাকতে হয়। ছাত্রলীগ দাবি করছে হলছাড়া ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা আর্থিক সহযোগিতা করছেন। ঢাকার বাইরে থেকে আসা ছাত্রলীগ কর্মীদের প্রাথমিকভাবে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে থাকতে দেয়া হচ্ছে। পরে মেস করে দেয়া হচ্ছে। তবে বিতাড়িত অনেকে জানিয়েছে, নেত্রী টাকা দিলেও তা ক্ষতিগ্রস্ত কর্মীদের হাতে পৌঁছাচ্ছে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী গত সেমিস্টার পরীক্ষা দিতে পারেনি। অংশগ্রহণ করতে পারছে না টিউটোরিয়াল পরীক্ষায়। ছাত্রদলের ক্যাডাররা জসীম উদ্‌দীন হলের টিপুকে পরীক্ষা দিতে আসায় ক্যাম্পাসে মারধর করে। পরে পুলিশ তাকে উদ্ধার করতে গিয়েও রক্ষা করতে পারেনি। ক্যাম্পাসে সে তিনবার মার খেয়েছে।

ক্যাম্পাসে সাধারণ কর্মী শাহজাহান ও শিশির মার খেয়েছে। ছাত্রলীগের অনেক কর্মীকেই ছাত্রদলের ক্যাডাররা কয়েকদফা মারধর করে। নির্বাচনের এক মাস পর আপোসরফা করে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বাহাদুর বেপারী মধুতে আসেন। আত্মগোপন করে থাকা সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন ২২ জানুয়ারি ক্যাম্পাসে এলে তাকেও নাজেহাল করে। ছাত্রদলের ক্যাডারের হাত থেকে রক্ষা পায়নি একদা ছাত্রলীগ নেতা ও সাংবাদিক স্বপন বসু। পুলিশ ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের নানাভাবে হয়রানি করেই চলছে। গত মাসে রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় হানা দিয়ে পুলিশ ঢাকা মহানগরের ৮৫ জন যুবলীগ ও ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে। এদের মধ্যে ২০ জন ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী। ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর ২৬ ফেব্রুয়ারি রাতে সুধা সদন থেকে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নেতারা বের হয়ে আসছিলেন। এমন সময় সাদা পোশাকধারী গোয়েন্দা পুলিশের দল তাদের গ্রেপ্তার করে ডিবি অফিসে নিয়ে যায়। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে ছিলেন ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক লিয়াকত শিকদার, আনিসুর রহমান, কেন্দ্রীয় নেতা ফাহিম রহমান খান, এম এ মোমিন পাটোয়ারি, নজরুল ইসলাম বাবু, খান মঈনুল ইসলাম মোস্তাক, নাজমুল ইসলাম তুহিন, নাজমুল আহসান অনীক ও স্বপন কর্মকার। গ্রেপ্তারকৃতরা অভিযোগ করছে, পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদের

> সারাদেশের শিক্ষাঙ্গনে অস্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজ করছে। মরিয়া হয়ে উঠেছে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের ছাত্রসংগঠন ছাত্রদল। মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে ছাত্র শিবির। তাদের অমানবিক ও অগণতান্ত্রিক মনোভাবের কারণে সারা দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রলীগের কয়েক হাজার নেতা-কর্মীর আজ শিক্ষা জীবন বিপন্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে না থাকতে পেরে তারা অমানবিক জীবনযাপন করছে। বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে

দেশের মেডিকেল কলেজগুলো থেকে প্রায় চার শতাধিক ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী বিতাড়িত রয়েছে। তারা যেতে পারছে না কলেজে। অংশগ্রহণ করতে পারছে না পরীক্ষায়। ফলে মূল্যবান শিক্ষা জীবন হয়ে পড়েছে বিপন্ন। অথচ একজন মেডিকেলের ছাত্রকে চিকিৎসক বানাতে সরকারের খরচ হয় ১২ লাখ টাকা

সময় খুব অশোভন আচরণ করেছে। সারা রাত কিছুই খেতে দেয়নি। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে খান মঈনুল ইসলাম মোস্তাক, রনিকে ছেড়ে দেয়া হয়। বাকিদের এক মাসের ডিটেনশন দেয়া হয়েছে। গ্রেপ্তার হবার কয়েক ঘন্টা আগে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের ওপর নির্যাতনের প্রসঙ্গে লিয়াকত সিকদার কথা বলেন ২০০০-এর সঙ্গে। তিনি বলেন, 'ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের থাকতে দেয়া হচ্ছে না ক্যাম্পাসে। এ ঘটনা পুরনো হয়ে গেছে। এখন তো মনে হচ্ছে বাসায়ও থাকতে পারবে না পুলিশের অত্যাচারে।' ছাত্রলীগ নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট ডেকেছে। এমন অবস্থার মাঝেও ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব কমেনি। বিতাড়িত হয়েও গ্রুপগুলো সক্রিয়। নির্বাচনের পরেও ছাত্রলীগের একমাত্র দখলে জহুরুল হক হল ছিল।

বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রুপ বলে পরিচিত লিয়াকত শিকদার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল সংগঠনিক সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন, মঈনুদ্দিন বাবুর নিয়ন্ত্রণে ছিল হলটি। কোনো হলে সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকনের বাগেরহাট গ্রুপের অস্তিত্ব না থাকায় তারা জহুরুল হক হলের ফরিদপুর গ্রুপের আধিপত্য মেনে নিতে পারেনি। এ কারণে অপরিকল্পিতভাবে বাগেরহাট গ্রুপ জগন্নাথ হলে ১৩ নবেম্বর হামলা চালায়। ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের বিতাড়িত করে। দখলের বিশ মিনিট পরেই তারা হল ছেড়ে চলে যায়। ফলে ক্যাম্পাসে উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করে। আরো মারমুখী হয়ে ওঠে ছাত্রদল। জহুরুল হক হল ছাত্রলীগের হাতছাড়া হয়ে যায়। আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হবার পর ছাত্রদল ক্যাডারে যোগদান করে। মুহসীন হলে নবাগতদের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। হলটির নিয়ন্ত্রণে ছিল বাগেরহাট গ্রুপ। নিয়ন্ত্রণ করতো আব্দুল ওয়াদুদ খোকন। শেল্টার পেত তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এসএ মালেক, বাহাউদ্দিন নাসিম, শেখ হেলাল, অজয় কর খোকনের কাছ থেকে। মুহসীন হলের এ গ্রুপটি ক্যাম্পাসে নানা ধরনের অপতৎপরতা চালাতো। বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর হলের নেতৃস্থানীয় ক্যাডাররা ফিরে যায় ছাত্রদলে। মনির আলিম যোগ দেয় ছাত্রদলে। ছাত্রদল তাদের বের করে দেয়। বর্তমানে হিরু, ডাবলু, আনিস, শিপন ছাত্রদলে রয়েছে।

দেশের মেডিকেল কলেজগুলো থেকে প্রায় চার শতাধিক ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী বিতাড়িত রয়েছে। তারা যেতে পারছে না কলেজে। অংশগ্রহণ করতে পারছে না পরীক্ষায়। ফলে মূল্যবান শিক্ষা জীবন হয়ে পড়েছে বিপন্ন। ঢাকা মেডিকেল কলেজের অবস্থা খুবই খারাপ। মেডিকেলের মেধাবী ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীর প্রায় ৫০ জন ছাত্র ক্লাসে যেতে পারছে না। ইন্টার্নি ডাক্তারদের ২০ জন হাসপাতালে যেতে পারছে না।

ছাত্রদলের নেতা ও সাবেক সংসদের জিএস শাওনের কাছে জিম্মি কলেজের সকল কার্যক্রম। নির্বাচনের পরের দিন মেডিকেল কলেজের হোস্টেল থেকে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের হল থেকে বের করে দেয়া হয়। বর্তমান কলেজের প্রিন্সিপাল তোফায়েল আহমদের সামনে থেকে ইন্টার্নি ডাক্তার বিজয়কে ছাত্রদলের ক্যাডাররা ধরে হলে নিয়ে আসে। হলে এনে মারধর করে। এ কলেজের ছাত্রলীগের ১৫ জন ছাত্র গত সেমিস্টার পরীক্ষা দিতে পারেনি। ছাত্রদল ২২ নবেম্বর ঢাকা মেডিকেল কলেজের হল সংসদ নির্বাচন কর্তৃপক্ষকে চাপ দিয়ে করিয়ে নেয়। এ নির্বাচনে ঢাকা মেডিকেলে প্রথম বারের মতো ছাত্র শিবির প্যানেল দেয়। অভিযোগ রয়েছে, নির্বাচনে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ভোট দিতে আসতে বাধ্য করছে। ছাত্রদের ছাত্রদলকে ভোট দিতে বাধ্য করেছে। মূলত ছাত্রদলের কয়েকজন ক্যাডারের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। অথচ আওয়ামী লীগ শাসনামলে ঢাকা মেডিকেলের ফজলে রাব্বী হলের সহঅবস্থান ছিল। ফজলে রাব্বী হলে ভাগ হয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের নেতা কর্মীরা থাকতো।

বর্তমানে সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজেও একই চিত্র। গত ১৩ অক্টোবর কলেজের সাংগঠনিক সম্পাদক প্রাণকে ছাত্রদল ক্যাডাররা রড দিয়ে মারধর করে। মারাত্মক মারধরে মেধাবী ছাত্র প্রাণের কিডনির সমস্যা দেখা দিয়েছে। এ কলেজেরও ২০-২৫ জন ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী বাইরে রয়েছে। ময়মনসিংহ, সিলেট মেডিকেল কলেজেও একই চিত্র। একজন মেডিকেলের ছাত্রকে চিকিৎসক বানাতে সরকারের খরচ হয় ১২ লাখ টাকা। অথচ হীন রাজনৈতিক কারণে মেডিকেলের মেধাবী ছাত্রদের শিক্ষা জীবন আজ বিপন্ন হচ্ছে। নির্বাচনের পর ঢাকা কলেজ থেকেও বিতাড়িত হয় ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা। হলে অবস্থান নিয়েছে ছাত্রদলের সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনী। তাদের মরিয়া চাঁদাবাজিতে অতিষ্ঠ আজ নিউমার্কেট, গাউসিয়া, চাঁদনীচকের ব্যবসায়ীরা।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের অবস্থান এমনিতে দুর্বল ছিল। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে শতাধিক ছাত্র হলের বাইরে অবস্থান করছে। ছাত্রলীগের এমনও অনেক কর্মী আছেন যারা একবার নয় বহুবার নির্যাতিত হয়েছেন। ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির সভাপতি মেহেদী ও সাধারণ সম্পাদক সৈকত এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে অবস্থান করছে। নির্যাতনের ভয়ে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে পারছে না। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে হলগুলোতে সহঅবস্থান থাকলেও এখন সবগুলো হল ছাত্রদলের দখলে। ছাত্রলীগের কর্মীরা বার বার প্রশাসনকে হলে উঠিয়ে দেবার দাবি জানালেও কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে নীরব।

সারা দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের ওপর চলছে নির্যাতন। কয়েক হাজার ছাত্রলীগ কর্মী এখন জেলে আছে বলে কেন্দ্রীয় নেতারা দাবি করেছে। বরিশালের জেলা ছাত্রলীগের সহসভাপতি সাইদুর রহমান ফারুককে সন্ত্রাসীরা ৭ ফেব্রুয়ারি অপহরণ করে নিয়ে যায়। তার ওপর আমানবিক নির্যাতন চালানো হয়। গাজীপুর জেলার ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আমানত হোসেন খানকে জেলা প্রশাসকের অফিসের সামনে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা ঘিরে ধরে। তাকে মারাত্মকভাবে আহত করে। শরীয়তপুরের ডামুলিয়ায় নিহত হয়েছেন ছাত্রলীগ কর্মী রোমান সিকদার। তাকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

পাঁচ শতাধিক কর্মীর অনিশ্চিত ছাত্রজীবন

আমাদের চট্টগ্রাম প্রতিনিধি সুমি খান জানিয়েছেন, চট্টগাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গত সাত মাস ধরে ঢুকতে পারছে না

ছাত্রলীগের হলে অবস্থানকারী পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী। বিপরীতমুখী হলেও একই দাবি ছিল ছাত্রলীগ ও শিবিরের। সেই চাপের মুখে বিএনপি'র তিনধারা জোর লবিংয়ে মীর নাছির-সাকা চৌধুরী লবির ভিসি প্রার্থী নূরুদ্দিন চৌধুরী ২ ফেব্রুয়ারি ভিসি পদে নিয়োগ পান সেই রাতেই তিনি শিবির নেতা-কর্মীর সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন। এদিকে ছাত্রলীগের সঙ্গেও বৈঠকে বসবার ঘোষণা দিলেও সেটা বাস্তবে হয়নি।

১৩ আগস্ট ২০০০ শিবির-ছাত্রলীগ সশস্ত্র সংঘর্ষের পর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। সে দিনই ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের শেষ দিন ছিল। সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত উভয় পক্ষ একে-৪৭সহ অত্যাধুনিক অস্ত্র নিয়ে প্রতিপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রশাসন হলত্যাগের জন্যে বিকেল ৪টা পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয়। অপ্রস্তুত সাধারণ ছাত্ররা হলত্যাগে বাধ্য হয়।

আবার বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ঘোষণা দেন তৎকালীন উপাচার্য ফজলী হোসেন। ৩ নবেম্বর ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে ঢুকবার পথে নিরস্ত্র ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সশস্ত্র শিবির ক্যাডার বাহিনী। ১ নং গেট স্টেশনে পুলিশ প্রশাসন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরসহ সবার সামনে এ নগ্ন হামলার নীরব দর্শকের ভূমিকা ছিল পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের। ৪ নবেম্বর থেকে লাগাতার অবরোধ ডাকে ছাত্রলীগ। তৎকালীন উপাচার্য ফজলী হোসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস চালু রাখতে চাইলে আওয়ামী বামধারার শিক্ষকদের প্রকাশ্য বিরোধিতায় এ উদ্যোগ ব্যর্থ হয়।

এর মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসবার দিন থেকেই ক্যাম্পাস থেকে সরে যায় ছাত্রলীগ চবি শাখার নেতৃবৃন্দ। মাঝখানে কয়েকবার চেষ্টা করেও ক্যাম্পাসে ঢুকবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাবশালী ছাত্রনেতা আলী মর্তুজা নিহত হয় শিবির ক্যাডার হাবিব খানের সন্ত্রাসী বাহিনীর হাতে। এমন অভিযোগ পুলিশ এবং দলীয় সূত্রের।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের দুটি ছাত্রাবাসের মধ্যে আবদুর রব হলের ১০/১২ জন শিবির কর্মী-সমর্থক ও উত্তর ক্যাম্পাসের সোহরাওয়ার্দী হল, এএফ রহমান হল ও আলাওল হল ছিল বরাবরই শিবিরের নিয়ন্ত্রণে। গত ৭ অক্টোবর বীরদর্পে সবক'টি হলে শিবিরের ক্যাডার বাহিনীর নেতৃত্বে শিবিরের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

এসব হলে নিরীহ ছাত্রদের অনেকেই ১৩ আগস্ট ছিল না বা অপ্রস্তুত হয়ে হলত্যাগ করে; সবারই সামান্য সম্বল (যা তাদের কাছে অসমান) শিবির নেতা-কর্মী বাহিনীর লুটে নেয়া সম্পদের পরিমাণ বাড়িয়েছে। এতেই শেষ নয়, প্রতিটি ছাত্রাবাসের হাউজ টিউটর ও শিবির নির্বাচিত এবং নিয়ন্ত্রিত। কার্যত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের চালিকাশক্তি শিবির।

গ্রেফতার হলেন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতারা

ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় নেতা ও কর্মীদের মাঝে দূরত্ব বেড়ে গিয়েছিলো। ফলে সংগঠনের ভিত দুর্বল হয়ে পড়ে। এই দূরত্ব কমিয়ে আনতে হবে। নেত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দেশনায় সংগঠনকে আরো দৃঢ় করতে হবে

খান মঈনুল হোসেন মোস্তাক

এ পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় নেত্রীর চাপ আসছে। ছাত্রলীগ স্থানীয় নেতৃবৃন্দও তৎপর হচ্ছে। তবে দৃশ্যত ছাত্রলীগের অন্তর্কোন্দল কমলেও কার্যত অপরিবর্তনীয়ই রয়েছে। এর মধ্যে বাহাদুর বেপারী এবং সাবেক প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের চট্টগ্রামে এসে ছাত্রলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের নিয়ে বসলেও সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

গত ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্রদল সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান করলেও শিবিরের ক্যাডার বাহিনীর সার্বক্ষণিক উপস্থিতি সেই অনুষ্ঠানে ও শিবির নিয়ন্ত্রিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি বুঝিয়ে দেয়। এ অবস্থায় ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের মধ্যেও চাপা ক্ষোভ দেখা দেয়।

বর্তমান উপাচার্য ১ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ১৫ দিনের মধ্যে সব ছাত্র সংগঠন নিয়ে বৈঠক করে বিশ্ববিদ্যালয় চালু করার প্রতিশ্রুতি দেন বলে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়। তবে ছাত্রলীগের তিনদফা দাবির প্রতি চ.বি প্রশাসন কতোটা আন্তরিক এবং শিক্ষক-কর্মচারিদের বিশ্বাসযোগ্যতা আদায়ে প্রশাসন কতোটা সফল হবে তার ওপরেই নির্ভর করছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন।

খুলনা মেডিকেল

যশোর প্রতিনিধি মামুন রহমান জানান, সরকার পরিবর্তনের পর খুলনার শীর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গেছে। ক্ষমতা হারানোর পর আওয়ামী সমর্থকদের কেউ কেউ স্বেচ্ছায় চুপসে গেছে, না হয় তাদের জোর-জবরদস্তি করে চুপ থাকতে বাধ্য করা হয়েছে। আবার কোথাও কোথাও ছাত্রদলের ক্যাডাররা অস্ত্রের মুখে ভয়ভীতি দেখিয়ে হল থেকে বের করে দিয়েছে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের। এমনি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম খুলনা মেডিকেল কলেজ। বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ছাত্রদলের ক্যাডাররা ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের পিটিয়ে হল থেকে বের করে দিয়েছে। এদের অনেকেই এখন হল ছেড়ে বাসা ভাড়া করে বাইরে থাকেন। আবার সমঝোতা করে কেউ কেউ হলেই ফিরে এসেছেন। তবে এজন্য তাদেরকে প্রতি মাসে ছাত্রদলের ক্যাডারদের ৩০০ টাকা করে সেলামি দিতে হয়।

২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকার সময় খুলনা মেডিকেল কলেজে শুধু ছাত্রলীগের ৪১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ছিল। বেলাল হোসেন সভাপতি ও মোস্তাফিজুর রহমান ঐ কমিটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তবে তারা অন্যান্য দল সমর্থিত ছাত্রদের সঙ্গে সহাবস্থান করতেন। কিন্তু গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভরাডুবি হলে দ্রুত পরিস্থিতি পাল্টে যায়। বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন জোট সরকার শপথ নেয়ার পর ১০ অক্টোবর রাতে ছাত্রদল ক্যাম্পাসে প্রথম মিছিল বের করে। তাদেরকে স্বাগত জানিয়ে ছাত্রলীগ পাল্টা মিছিল বের করলে ছাত্রদলের ক্যাডাররা বহিরাগত সন্ত্রাসীদের নিয়ে এ মিছিলে হামলা চালায় এবং হলে উঠলে শেষ করে ফেলা হবে বলে হুমকি দেয়। মূলত এ ঘটনার পর থেকেই ভড়কে যান ছাত্রলীগ সমর্থিত নেতা কর্মীরা।

বেপরোয়া ছাত্রদল

বেপরোয়া হয়ে উঠছে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। অন্তর্দ্বন্দ্বে ভেঙে পড়েছে সংগঠনের চেইন অব কমান্ড। বিশাল আকারের ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সবাই ব্যস্ত নিজের আখের গোছাতে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে নিয়ন্ত্রণ না থাকায় হলগুলোতে অবস্থানরত সশস্ত্র ক্যাডার গ্রুপ হয়ে পড়েছে লাগামছাড়া। দলীয় কার্যক্রম স্থগিত ও কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নাসিরউদ্দিন আহমেদ পিন্টুকে গ্রেপ্তার করার পরেও ছাত্রদলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না।

আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে ছাত্রদল নিজেদের মধ্যে বিরোধ নিয়েই ব্যস্ত ছিল। নাসিরউদ্দিন পিন্টুকে ছাত্রদলের সভাপতি করার পর কমিটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে শাহাবুদ্দিন লাল্টুর গ্রুপ। পিন্টুকে তখন অছাত্র ঘোষণা করে ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে। ছাত্রলীগ ছাত্রদলের এ দ্বন্দ্বের সুযোগ নেয়। দুই গ্রুপ অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকার কারণে সরকারবিরোধী কার্যত কোনো আন্দোলন ছাত্রদল গড়ে তুলতে পারেনি। অবশেষে ছাত্রদলের কমিটি নিয়ে হস্তক্ষেপ করেন তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া। তিনি গত বছর ২৫ মে নাসিরউদ্দিন পিন্টু সভাপতি ও শাহাবুদ্দিন লাল্টুকে সাধারণ সম্পাদক করে সমঝোতা কমিটি গঠন করে দেন। এ সমঝোতায় আত্মাহুতি দিতে হয় বিগত কমিটির সাধারণ সম্পাদক হাবিব-উন-নবী সোহেলকে। নতুন কমিটি ঘোষণার পর অধিভুক্ত হতে থাকে কেন্দ্রীয় কমিটির অন্য পদগুলো। কমিটি অনুমোদনের পর ছাত্রদলের ২৫১ জনের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়। এ সংক্রান্ত একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিও পত্রিকায় দেয়া হয়। তবে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তখন ২১৯ জনের নাম উল্লেখ ছিল। ঘোষণা অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ হতে তখনও প্রয়োজন ছিল ৩২ জন নেতার নাম ঘোষণা। কমিটি নিয়ে পরে পিন্টু ও লাল্টুর মধ্যে সমঝোতা হয়। এই সমঝোতায় কমিটির পরিধি আরো বেড়ে যায়। দুই গ্রুপের মধ্যে গণহারে কমিটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ কমিটির শেষ সংখ্যা দাঁড়ায় ২৯৬। কমিটির সভাপতি ৪২ সহ-সাধারণ সম্পাদক ৬৩, যুগ্ম সম্পাদকের সংখ্যা ২২, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ৬ জন। সমঝোতার মাধ্যমে কমিটি গঠন করতে গিয়ে বয়োবৃদ্ধ অছাত্র ও নাম সর্বস্ব নেতারাই স্থান করে নেয়। খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, কমিটি স্থান পেয়েছে আড়তদার, গৃহবন্ধু, করপোরেশন ও এলজিআরডির ঠিকাদার ও ক্ষুদে ব্যবসায়ী। কমিটিতে স্থান করে নিতে ব্যর্থ হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, মেডিকেলের মেধাবী ছাত্ররা। কমিটি গঠনের কিছুদিনের মধ্যে ছাত্রদলের আবারও বিবাদ শুরু হয়। ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা সভাপতি নাসিরউদ্দিন পিন্টু, সাধারণ সম্পাদক শাহাবুদ্দিন লাল্টু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের সভাপতি মনির হোসেনের নেতৃত্বে তিনটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১ অক্টোবরের জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের ভরাডুবির পর সক্রিয় তিনটি গ্রুপ হল দখলের প্রতিযোগিতায় নামে। বর্তমান তিনটি গ্রুপের ক্যাডাররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে। এ গ্রুপগুলো ক্যাডাররা নিজস্ব গ্রুপের নেতা বাদে অন্যকে নেতা মানতে নারাজ। এ কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি ক্রমেই অবনতি ঘটছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হল এখন মনির, বাবু-আসাদের নেতৃত্বে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এদের সঙ্গে রয়েছে গোলাম হাফিজ, নাহিদ, মাসুদ, বাবলু। এ হলে প্রায় বহিরাগতদের আনাগোনা থাকে। তবে শিশির হল থেকে বিতাড়িত হবার পর পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। সূর্যসেন হল পিন্টু ও মামুনের নেতৃত্বে নিয়ন্ত্রিত হয়।

ছাত্রদলের অগণতান্ত্রিক মনোভাবের কারণে ছাত্রলীগের কয়েক হাজার নেতা-কর্মীর শিক্ষা জীবন আজ বিপন্ন হয়ে পড়েছে। অসংখ্য নেতা-কর্মীরা জেলে রয়েছে। জোট সরকার সম্মেলনে বাধা দেয়ার জন্য কেন্দ্রীয় নেতাদের গ্রেফতার করেছে

বাহাদুর ব্যাপারী *সভাপতি ছাত্রলীগ*

কিন্তু এর পরও তাদের নেতৃস্থানীয়রা হলে প্রবেশ করলে ছাত্রদলের ক্যাডাররা তাদের হল থেকে জোর করে বের করে দিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, ছাত্রলীগ পরিচালিত সন্ধানী ডোনার ক্লাবটিও তারা বন্ধ করে দেয়।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের হল থেকে বের করে দেয়ার পর মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট মঞ্জুরুল ইমাম, ড্যাব নেতা রফিকুল ইসলাম বাবলু, বিএমএসহ কলেজ প্রশাসনের কর্মকর্তারা বৈঠকে বসেন। সমঝোতা বৈঠকের পরে ছাত্রদলের ক্যাডাররা প্রতিনিয়ত শো-ডাউন করতে থাকে এবং নির্দেশ জারি করে, হলে থাকতে হলে প্রত্যেককে মাসে ৩০০ টাকা করে সেলামি দিতে হবে। কিন্তু এতে যারা রাজি হয়নি তারা হলে থাকতে পারেনি। এই তালিকায় রয়েছেন কলেজ শাখার সভাপতি বেলাল হোসেন ছাড়াও ছাত্রলীগ নেতা আনিসুর রহমান, রাজিব আহমেদ, তাজুল ইসলাম, ফয়সাল হোসেনসহ আরো অনেকে। তাদের রুমগুলো এখন তালাবদ্ধ।

ক্ষমতা বদলের রেশ শুধু খুলনা মেডিকেল কলেজেই পড়েনি, পড়েছে দেশের একমাত্র রাজনীতিমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় খুলনাতেও। উপাচার্য থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ সব পদে যেমন দলীয় লোকদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে, তেমনি তাদের লোকজনই এখন সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে।

অন্যদিকে খুলনার ফুলবাড়ীতে অবস্থিত বিআইটিতে অধ্যয়নরত ছাত্রলীগের ছেলেরাও বর্তমানে সন্ত্রস্ত্র অবস্থায় রয়েছে। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ছাত্রদল ও তাদের সমর্থকরা ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের পিটিয়ে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দিয়েছিল। অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থাও প্রায় একই।

বিশ্ববিদ্যালয় দখলে ছাত্রদল বনাম ছাত্রদল

সিলেট প্রতিনিধি নিজামুল হক বিপুল জানান, দেশের অন্য ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মত শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্ষমতার পালাবদল ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর দখল সংস্কৃতিতে মেতে ওঠে বর্তমান জোট সরকারের অন্যতম বিএনপি'র ছাত্রশাখা ছাত্রদল। আরেক শরিক মৌলবাদী জামায়াতে ইসলামীর ছাত্রশাখা ইসলামী ছাত্রশিবিরও দখল রাজনীতিতে পিছিয়ে নেই এখানে।

রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর শাবিপ্রবি'র একমাত্র ছাত্রহল শাহপরান হল ছাত্রদল দখলে নিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ

হলের সাইদ, ফরহাদ, টিটো আরিফ তাদের সমর্থক। এ হলে অন্য কোনো গ্রুপকে থাকতে দেয়া হয় না। এ কারণে লাল্টু গ্রুপের পলাশ ও অন্যান্য নেতা-কর্মী হলে থাকতে পারছে না। বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি এবিএম মোশাররফ হোসেন তাদের সমর্থন দিয়ে থাকেন। এসএম হল পিন্টু ও টিটো গ্রুপ নিয়ন্ত্রণ করছে। টগর, মনির, সোহাগ, মাসুম, বিল্লাহ তার সমর্থকপুষ্ট। এর রয়েছে বেশ কিছু বহিরাগত। বিভিন্ন ধরনের ছিনতাই, চাঁদাবাজি করার অভিযোগ রয়েছে হলের নামে। জহুরুল হক হল লাল্টু গ্রুপের নেতৃত্বাধীন নিয়ন্ত্রিত। তবে আগে মনির, আসাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। হলে মিশু লাল্টু গ্রুপের সমর্থকপুষ্ট। এ হলে সব গ্রুপের নেতা-কর্মী রয়েছে। জগন্নাথ হল নেতৃত্ব দিচ্ছে জয়ন্ত কুন্ডু ও তরুণ। মুজিব হল পিন্টু ও টিটোর নেতৃত্বে নিয়ন্ত্রিত। কাওসার, মাসুদ, তামিন, মোর্শেদ তাদের সমর্থকপুষ্ট। আমিন এখন জেলে রয়েছে। জসীম উদ্‌দীন হল মনির, বাবু, আসাদের নেতৃত্বে নিয়ন্ত্রিত। তবে লাল্টু গ্রুপেরও কিছু নেতা-কর্মী আছে। লাল্টু গ্রুপের লুৎফর, শিপন এখন জেলে। কার্জন হল এখন তুলনামূলক ভালো আছে। শহীদুল্লাহ হল মনির, বাবু, আসাদের নেতৃত্বে নিয়ন্ত্রিত হয়। ইমরান তাদের সমর্থকপুষ্ট। তবে সব গ্রুপের নেতা-কর্মী হলে রয়েছে। হলে বহিরাগত নেই। হল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় দু'জন বহিরাগত ছাত্রদল ক্যাডারকে ঈদের আগে হল থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। বর্তমানে হলে ইমরানের গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। একুশে হলে ছাত্রদলের কোনো কমিটি গঠন করা হয়নি। একুশে হলে এখন ছাত্রদলের কোনো কমিটি নেই। তবে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, রয়েল নামে একজন ছাত্রদলের নাম ভাঙিয়ে চাঁদাবাজি করে।

ক্যাম্পাসের হলগুলোতে রয়েছে অস্ত্রের ঝনঝনানি। একে-৪৭, শটগান, স্টেনগান, দোনলা বন্দুক, ৩২ কাটা রাইফেল, নিজস্ব পিস্তল রয়েছে হলগুলোতে। অস্ত্রগুলো আসে বিভিন্ন সোর্স থেকে। ছাত্রদলের লাল্টু গ্রুপের সমর্থকদাতা বিএনপি মহানগর সহ-সভাপতি সাইফুল ইসলাম রিপন, সাইদুর রহমান নিউটন ও গিয়াস উদ্দিন মামুন। পিন্টু গ্রুপ সমর্থন পায় মির্জা আব্বাস, মোসাদ্দেক হোসেন ফালুর কাছ থেকে। কামরুজ্জামান রতন, ইলিয়াস খান, বোস্টার মানিক মনির গ্রুপের সমর্থক দাতা। গ্রুপগুলো অস্ত্র ও অর্থ এ উৎস থেকে পেয়ে থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে। কেন্দ্রীয় কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকায় বিভিন্ন গ্রুপের চাঁদাবাজির কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, হলগুলোর কেন্টিন মালিকদের নাভিশ্বাস উঠছে। মেসগুলো বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। চাঁদাবাজির অভিযোগ রয়েছে ক্যাম্পাসে ভাসমান ফাস্টফুড, এমনকি চায়ের দোকান থেকে। চাঁদাবাজির কারণে শাহবাগের বিখ্যাত খাবারের দোকান সিলভানা বন্ধ হয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় নেতাদের এখন আর মধুতে পাওয়া যায় না। তারা ব্যস্ত সচিবালয়ে তদবিরে, শিক্ষা অধিদপ্তর বা এলজিআরডির টেন্ডারবাজিতে। দলীয় কার্যক্রম স্থগিত থাকায় কেন্দ্রীয় নেতাদের তদবির ও টেন্ডারবাজির কাজ করতে ভালোই হয়েছে। ছাত্রদলের নীতিহীন মনোভাবের কারণে শাসকদল বিএনপি'র জনপ্রিয়তায় ধস নামছে। প্রতিদিনই খবরের কাগজে আসছে তাদের অনৈতিক কার্যকলাপের খবর।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হবার পর ছাত্রলীগ ইতিবাচক রাজনীতির ধারা প্রচলন করেছিল। আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা খুঁজে বের করেছিলেন নিয়মিত ও মেধাবী ছাত্রদের। বিএনপি এখন ক্ষমতায়। এ কারণে অছাত্রদের ছাত্রদলের নেতৃত্বে নিয়ে আসার রীতি বদলানো প্রয়োজন। দেশ ও দলের স্বার্থেই ছাত্রদলের নেতৃত্বে বুয়েট, মেডিকেল বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রদের সমন্বয় প্রয়োজন। একজন মেধাবী ছাত্রকে সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক পদে আনলে মুহূর্তে বদলে যাবে ছাত্রদলের ভাবমূর্তি। নাসিরউদ্দিন পিন্টুর পরিবর্তে একজন বুয়েট ছাত্র বা মেডিকেল ছাত্রকে সভাপতি বানালে সুনাম হবে বিএনপি'রই।

ছাত্রছাত্রীরা এখনো চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। এর কারণ অবশ্য ছাত্রদলই। সংগঠনটির প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপগুলো এখনো একমাত্র হলটিকে নিজেদের করায়ত্ত করতে জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। হল দখলের পাশাপাশি ছাত্রদলের প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের সন্ত্রাসীরা সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি চালিয়ে যাচ্ছে সমানতালে। তাও আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যে। যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে শুরু করে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা পর্যন্ত সবাই চরম উদ্বিগ্ন।

'৯৬-এর সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে আ'লীগ সরকার গঠন করলে ছাত্রলীগ হলটি নিজেদের দখলে নেয়। ঐ সময় ছাত্রলীগ ছাত্রদলকে হল থেকে বিতাড়িত করে এবং ছাত্রদল সমর্থকদের বেশ কয়েকটি কক্ষ ভাংচুর করে ও পুড়িয়ে দেয়। ওই সময় থেকে ছাত্রদল আওয়ামী শাসনের পাঁচবছর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিন্দুমাত্র সুবিধা আদায় করতে পারেনি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর হল দখলে তৎপর হয়ে ওঠে ছাত্রদল শাবিপ্রবি শাখা। তারা নানাভাবে চেষ্টা চালায় বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান নেয়ার। কিন্তু ছাত্রলীগ নিজদের অবস্থান ধরে রাখায় ছাত্রদলের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সংঘাতের পথ পরিহার করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহপরান হল দখলের জন্য ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। তারা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রহল থেকে অবৈধ ছাত্রদের উচ্ছেদ, অস্ত্র উদ্ধার, হল প্রভোস্টের পদত্যাগসহ ১০ দফা দাবিতে আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রধর্মঘট শুরু করে। লাগাতার ছাত্র ধর্মঘটের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় অচল হয়ে পড়ে।

কিন্তু ৩ দিনের মাথায় ২১ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের একাংশ পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট শুরু করে। এনিয়ে সংগঠনটির নিজেদের মধ্যে বিভক্তি দেখা দেয়। পরে সিলেট প্রেসক্লাব নেতৃবৃন্দ পুনরায় মধ্যস্থতা করলে ছাত্রদল ধর্মঘট প্রত্যাহার করে। কর্তৃপক্ষ ওই সময়ে সিদ্ধান্ত নেয় হলে অবস্থানরত অবৈধ ছাত্ররা ৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে হল থেকে বের হয়ে না গেলে কর্তৃপক্ষ ৫ সেপ্টেম্বর ঝটিকা অভিযানের মধ্য দিয়ে অবৈধ ছাত্রদের হল থেকে বের করে দেবে। কিন্তু জেলা বিএনপি মধ্যস্থতাকে উপেক্ষা করে ছাত্রদল ৫ সেপ্টেম্বর হঠাৎ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট শুরু করে। ৮ সেপ্টেম্বর রাতে হলে ছাত্রদল-ছাত্রলীগের মধ্যে ব্যাপক গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। এতে এক ছাত্রলীগ কর্মী আহত হয়। ৯ সেপ্টেম্বর ছাত্রদল-ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে পাল্টাপাল্টি মিছিল সমাবেশ করে। ছাত্রদলের সমাবেশে ঐ দিন ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়। পরিস্থিতি অবনতির আশঙ্কায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১০ সেপ্টেম্বর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ধর্মঘটের কৌশল অবলম্বন করে শাবি ছাত্রদল মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র ছাত্র হলটি নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। ১০ সেপ্টেম্বর অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাওয়া বিশ্ববিদ্যালয় যখন ১০ অক্টোবর খোলে। তখন ছাত্রলীগ মূলত ক্যাম্পাস ছাড়া। ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত অষ্টম সাধারণ নির্বাচনে আ'লীগের বিপর্যয় ঘটলে ছাত্রলীগ আর হলে ফিরে যায়নি এবং হল পুনঃদখলের সাহস করেনি। সঙ্গত কারণে দেশের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মত শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হলটি ছাত্রদল বিনা বাধায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়।

হল বেদখল হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পঞ্চম দিনের মাথায় ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে ১৫ অক্টোবর ক্যাম্পাসে অবস্থান নেয়। ঐ দিন ছাত্রদল ছাত্রলীগ মুখোমুখি অবস্থান

নিলে এক পর্যায়ে উভয় পক্ষের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ও গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে। ঐ ঘটনায় ৩ ছাত্রদল কর্মী আহত হয়। আর পুলিশ গ্রেপ্তার করে ১০ ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীকে। ঐ দিনই মূলত শাবি শাখা ছাত্রলীগ পুরোদমে ক্যাম্পাস ছাড়া হয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান ধরে রাখার জন্য ছাত্রলীগ ছাত্রদলের মত ধর্মঘটের কৌশল অবলম্বন করে। তারা শাহপরান হলে সকল বৈধ ছাত্রদের অবস্থান নিশ্চিতকরণ, শাবি ক্যাম্পাসে সকলের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার থেকে শুরু করে অক্টোবর পর্যন্ত ক্যাম্পাসে সংঘটিত সকল সন্ত্রাসের তদন্তের জন্য কমিটি গঠনের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রধর্মঘট শুরু করে ৫ নবেম্বর থেকে। ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট ডাকলেও ক্যাম্পাসে যেতে পারেনি। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধান ফটক থেকে শহরের মদীনা মার্কেট ও সুবিদবাজার এলাকায় বাইরের শক্তি নিয়ে ধর্মঘট করে ও বিশ্ববিদ্যালয় অচল করে দেয়। তবে শেষ পর্যন্ত ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে ১৪ নবেম্বর থেকে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেয়। এরপর থেকে ছাত্রলীগ এখন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে।

> আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হবার পর ছাত্রলীগ ইতিবাচক রাজনীতির ধারা প্রচলন করেছিল। আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা খুঁজে বের করেছিলেন নিয়মিত ও মেধাবী ছাত্রদের। বিএনপি এখন ক্ষমতায়। এ কারণে অছাত্রদের ছাত্রদলের নেতৃত্বে নিয়ে আসার রীতি বদলানো প্রয়োজন। দেশ ও দলের স্বার্থেই ছাত্রদলের নেতৃত্বে বুয়েট, মেডিকেল বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রদের সমন্বয় প্রয়োজন। একজন মেধাবী ছাত্রকে সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক পদে আনলে মুহূর্তে বদলে যাবে ছাত্রদলের ভাবমূর্তি

সংগঠন চাঙ্গা করতে সম্মেলন

বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির মেয়াদ দুই বছর আগেই শেষ হয়েছে। সংগঠন গোঁছাতে আগামী ৩ এপ্রিল সম্মেলনের তারিখ নির্ধারিত হয়েছে। নতুন কমিটিতে স্থান পেতে তৎপর হয়ে উঠেছে ছাত্রলীগের অনেক নিষ্ক্রিয় কর্মী। দলে সক্রিয়ভাবে এখন কাজ করছেন কেন্দ্রীয় কমিটিসহ সভাপতি কাজী এবাদত হোসেন, সাহাবুদ্দিন ফরাজি, বলরাম পোদ্দার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত সিকদার, আনিছুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফুল আজিম, সম্পাদকের মধ্যে সাইফুদ্দিন নাসির, মশিউর রহমান, গোলাম সারওয়ার টুকু, বদিউল আলম, রফিকুল ইসলাম কোতোয়াল, আবদুল ওয়াদুদ খোকন, খলিলুর রহমান, মিহির কান্তি ঘোষাল, আবদুল আলিম, শহীদুল্লাহ হলের সভাপতি হেমায়েত উদ্দিন হিমু, ফজলুল হক হলের সভাপতি সাইফুজ্জামান সাগর, জগন্নাথ হলের সাধারণ সম্পাদক পংকজ সাহা, জহুরুল হক হলের সাধারণ সম্পাদক আওলাদ হোসেন তিতু, সলিমুল্লাহ হলের সভাপতি রেজাউল করিম রেজা, কুয়েত মৈত্রী হলের সাধারণ সম্পাদক অপর্ণা সেন। মধুতে তাদের প্রায়ই দেখা যায়। চলছে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য তীব্র লবিং, গ্রুপিং। সভাপতি পদের জন্য তৎপরতা চালাচ্ছে লিয়াকত শিকদার, রফিকুল ইসলাম কতোয়াল, আমিনুল ইসলাম, গাজি মেজবাহুল হোসেন, বলরাম পোদ্দার, আনিসুর রহমান, কাজি এবাদ, সাধারণ সম্পাদকের জন্য তৎপর খান মঈনুল ইসলাম মোস্তাক, নজরুল ইসলাম বাবু, আব্দুল ওয়াদুদ খোকন, আশরাফুল আমিন রুবন, মিহির কান্তি ঘোষাল, মাযহার আনাম, গোলাম সারোয়ার টুকু। তবে ৩ এপ্রিল সম্মেলনের আগেই কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে ছাত্রলীগের অধিকাংশ জেলা কমিটির সম্মেলন শেষ করার সিদ্ধান্ত হয়। এখনও একটি জেলায়ও সম্মেলন হয়নি। এ কারণে দল গোছানোর জন্য সম্মেলন। এ উদ্দেশ্য অর্জিত নাও হতে পারে। কেন্দ্রীয় নেতা খান মঈনুল হোসেন মোস্তাক ছাত্রলীগের কার্যক্রম সম্পর্কে ২০০০ কে বলেন, ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় নেতা ও কর্মীদের মাঝে দূরত্ব বেড়ে গিয়েছিলো। ফলে সংগঠনের ভিত দুর্বল হয়ে পড়ে। এই দূরত্ব কমিয়ে আনতে হবে। নেত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দেশনায় সংগঠনকে আরো দৃঢ় করতে হবে। ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বাহাদুর বেপারি ২০০০কে বলেন, 'ছাত্রলীগ সুচনালগ্ন থেকে দেশের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সাহসী ভূমিকা রেখেছে। ছাত্র সমাজের ন্যায়সঙ্গত দাবির জন্য সংগ্রাম করেছে। আমরা ইতিবাচক রাজনীতি বিশ্বাস করি। ছাত্রলীগের গৌরবের এ ধারাই আমরা প্রবর্তন করেছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সহঅবস্থান ছিল। সমস্ত ছাত্রের জন্য ছিল শিক্ষার পরিবেশ। আজ ছাত্রদলের অগণতান্ত্রিক মনোভাবের কারণে ছাত্রলীগের কয়েক হাজার নেতা-কর্মীর শিক্ষা জীবন বিপন্ন। নেতা-কর্মীরা জেলে রয়েছে। জোট সরকার সম্মেলনে বাধা দেয়ার জন্য কেন্দ্রীয় নেতাদের গ্রেফতার করেছে কোনো সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক সমাজে এ ধারা কাম্য হতে পারে না। আগামী সম্মেলনে ছাত্রলীগ গতিশীল হয়ে উঠবে।'

তবে পর্যবেক্ষকেরা মনে করেন ছাত্রলীগকে শক্তিশালী করতে হলে প্রতি জেলা, উপজেলা, ওয়ার্ড ভিত্তিক এখন কমিটি গঠন করতে হবে। প্রয়োজন দক্ষ ও স্বচ্ছ নেতৃত্ব। বন্ধ করতে হবে অঞ্চল ভিত্তিক দলীয় কোন্দল। ছাত্রদল নেতিবাচক রাজনীতি ও শিবিরের উত্থান প্রতিরোধে সমমনা দলগুলো মিলে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা।

সারাদেশের শিক্ষাঙ্গনে অস্থিতি-শীল পরিবেশ বিরাজ করছে। মরিয়া হয়ে উঠেছে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের ছাত্রসংগঠন ছাত্রদল। মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে ছাত্র শিবির। তাদের অমানবিক ও অগণতান্ত্রিক মনোভাবের কারণে সারা দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রলীগের কয়েক হাজার নেতা-কর্মীর আজ শিক্ষা জীবন বিপন্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে না থাকতে পেরে তারা অমানবিক জীবনযাপন করছে। বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। নির্বাচনের পর ছাত্র সংগঠনের অস্ত্রের আঘাতে এ পর্যন্ত দশ জন ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী প্রাণ হারিয়েছে। অথচ আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন থাকাকালীন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতারা দেশে ইতিবাচক এক ছাত্র রাজনীতির ধারা প্রবর্তন করতে চেয়েছিল। নেতৃত্বে নিয়ে এসেছিল নিয়মিত ছাত্রদের। হল দখলের প্রক্রিয়া চললেও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছিল সহঅবস্থান। হলে না থাকতে পারলেও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ক্যাম্পাসে রাজনীতি করেছে। ক্লাস ও পরীক্ষা দিয়েছে। ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠন শুধু প্রতিপক্ষকে হল বিতাড়িত করেই ক্ষান্ত হয়নি। শিক্ষক প্রহার, চাঁদাবাজি, দখল, টেন্ডারবাজি, ধর্ষণের সঙ্গেও নেতা-কর্মীর নাম সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে। বেপরোয়া ছাত্রদলকে নিয়ন্ত্রণে আনতে গ্রেপ্তার করা হয় সাবেক কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নাসিরউদ্দিন আহমেদ পিন্টুকে। স্থগিত করা হয়েছে দলীয় কার্যক্রম। তবু যেন ছাত্রদের নেতা ও কর্মীদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না। নির্বাচনে ভরাডুবি ও ছাত্রদলের অগণতান্ত্রিক কার্যক্রমে ছাত্রলীগের অবস্থা নাজুক। তবে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সংগঠনকে আবারও চাঙ্গা করার চেষ্টা করছেন। আগামী ৩ এপ্রিল সম্মেলন ঘোষণা করা হয়েছে। সম্মেলনের কারণে অনেক নেতা-কর্মী সংগঠনের কাজে সক্রিয় হয়ে উঠেছে।